সন্ন্যাসীর থলে
মনোজ বসু

প্রথম প্রকাশ **আনন্দমেলা**

৯ই শ্রাবন ১৩৯১

২৫শে জুলাই ১৯৮৪

১০ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা

সন্ন্যাসীর থলে

মনোজ বসু

চৈত্রের শেষ। অর্জুনের বড় স্ফূর্তি। দেশে-ঘরে যাচ্ছে সে একটানা তিন বছর আবাদ অঞ্চলে চাকরি-বাকরি করে। তিন বছরের পুরো মাইনে পকেটে। বার্ষিক ছ'টাকা হিসাবে, তিন-ছয়ে আঠারোর উপরেও সদাশয় মনিব বখশিস্ ধরে দিয়েছেন দু'টাকা। পুরোপুরি কুড়ি। চাট্টিখানি কথা নয়।

স্ফূর্তির তাই অবধি নেই। এত টাকা কিসে খরচ করবে অর্জুন কূল-কিনারা পায় না। হাঁটছে না সে, নেচে-নেচে যাচ্ছে। আর গান ধরেছে। সে উদ্দণ্ড গানের ঠেলায় গাছের পাখপাখালি পালানোর দিশা পায় না।

বিষম রোদ, জলতেষ্টা পেয়ে গেল। তেপান্তরের মাঠ—জনমনিষ্যি দেখা যায় না কোনো দিকে। জল বিনা প্রাণ আইঢাই করছে।

যেতে যেতে মাঠ-জঙ্গলের মধ্যে বাড়ি দেখা গেল। পুরোপুরি বাড়ি নয়। ছিল বোধহয় এক কালে পাকাবাড়ি, ভেঙেচুরে এখন ইটের স্তূপ। আর আগাছার ঘোর জঙ্গল। একটা-দুটো ছোট ঘর খাড়া আছে, ঠাহর করে-করে এখনও আন্দাজ পাওয়া যায়। মানুষ আছে কি না, বাইরে থেকে বোঝা যাচ্ছে না। অর্জুন চিৎকার করে, "আছেন কেউ ভিতরে? মানুষ থাকেন তো মুখে বলুন, আছি। ভূত হন তো গাছের ডাল ভাঙুন।"

অতি ক্ষীণ আওয়াজ এল গাছগাছালির ভিতর দিয়ে। মানুষ চলাচলের পথও একটু আছে, নজরে পাওয়া যায়।

অর্জুন আবার ডাক দেয়, ভাল করে সন্দেহ নিরসনের জন্য। পুনশ্চ আওয়াজ। আওয়াজের আন্দাজে ভিতরে ঢুকে গিয়ে দেখল, ভাঙা তক্তাপোষে ছেঁড়া মাদুরের উপর ঢাউস রকমের মোটা এক বুড়ো মানুষ। বৃদ্ধ কেঁদে বলেন, "ঠাকুর তোমায় পাঠালেন।"

অর্জুন ঘাড় নেড়ে বলল, "আজ্ঞে না, কেউ পাঠাননি আমায়। জলতেষ্টা পেয়েছে, তেষ্টার টানে এসে পড়েছি। দাদুমশায়ের নিজের বোধহয় ওঠার তাগত হবে না, মুখে বলে দিন, জল কোথায়! জল খেয়ে তেষ্টা মিটিয়ে তারপর আপনার কথাবার্তা সব শুনব।"

গৃহকোণের মেটে কলসি দেখিয়ে বৃদ্ধ বললেন, "কলসি রয়েছে, কিন্তু জল নেই। ন্যাড়া বলে এক ছোকরা থাকত আমার সঙ্গে। দেখাত যেন কত বড় ভক্ত। পরশু সকালে বার আষ্টেক ঘোরতর রক্তবমি হল আমার। বাঁচব না বুঝে সেই রাত্রেই ন্যাড়া যথাসর্বস্ব নিয়ে পিটটান দিয়েছে। এখন আমি একা, একেবারে নিঃস্ব।"

তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, এতসব দুঃখের কাঁদুনি শোনার ধৈর্য অর্জুনের নেই। কলসি নেড়েচেড়ে দেখল, জল এক ফোঁটাও নেই। বলে, "পুকুর-টুকুর কোন্ দিকে দেখিয়ে দিন। জল খেয়ে আসি আগে। নিঃস্ব না লাখপতি, কোন্টা আপনি, সে বিবেচনা তারপরে।"

জঙ্গুলে পুকুরঘাটে নেমে চার-পাঁচ আঁজলা জল খেয়ে তৃষ্ণা মিটিয়ে অর্জুন ফিরে এল। বলে, "বলুন এইবারে, শুনি।"

মিনমিন করে ক্ষীণকণ্ঠে বৃদ্ধ বলতে লাগলেন, "সাধুচরণ আমার নাম। স্ত্রী মারা যাবার পর দুত্তোর বলে সংসার ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছি। কাজকর্ম ব্যাপার-বাণিজ্য সমস্ত ছেলের কাঁধে। মধুগঞ্জে তার বড় গোলদারি দোকান। সে সেই সমস্ত নিয়ে আছে। আর আমার কাজ পাহাড়ে, জঙ্গলে সাধু-সন্ন্যাসীর তল্লাসে ঘোরাঘুরি, তাঁদের ভজন-পূজন। গায়ের এই গৈরিক কাপড়-চোপড়ের গুণে আমা হেন লোকেরও মাঝে-মাঝে দিব্যি শিষ্য-সাকরেদ জুটে যায়। এই তল্লাটে আস্তানা নেওয়ার পর সর্বশেষ জুটেছিল ন্যাড়া। গোড়ায়-গোড়ায় খুব সেবা করত সে, সর্বরকমে, রেঁধে খাওয়ানো থেকে শয়নের পর গা-হাত-পা টেপা অবধি। যখন-তখন আমার রক্তবমি দেখে সে বুঝে নিল, আমার দিন আর বেশি নেই। রাত্রিবেলা টাকার থলি আর হাতের মাথায় যা কিছু পেল, সমস্ত নিয়ে পিটটান। আমি এখন নিঃসম্বল। এত ধকল কাটিয়ে যে আবার উঠব এমন মনে হয় না।"

"উঠবেন কি পড়বেন, আমি যখন এসে গেছি, কদিনের মধ্যেই টের পাওয়া যাবে। দেখুন, মহাভারতের অর্জুন লড়াইয়ে হারত না। আমি এই কলির অর্জুন, হারিনে আমিও।"

মুখে বড়াই করে রোগীকে ভরসা দেয় অর্জুন। আর সেবাও করছে সে প্রাণপণে। বলে, "তিন বছরের মাইনে ট্যাঁকে নিয়ে ঘুরছি। মাইনের উপরে আরও বখশিস্। ভয় হয়েছিল, এ-বোঝা সারাজীবন বয়ে বেড়াতে না হয়। খরচের ভাল উপায় বেরিয়ে গেল। চিকিচ্ছের কোনোরকম ত্রুটি হবে না দাদু। রক্তপিত্তই হোক আর রাজযক্ষ্মাই হোক, 'বাপ বাপ' করে পালাবে।"

তারপর কবিরাজবাড়ি ছুটোছুটি, হাটে-মাঠে ওষুধ সংগ্রহ। হপ্তা কাটল। তিন বছরের মাইনের সঞ্চয় নিয়ে অর্জুনের বড় গর্ব, তার প্রায় আধাআধি কাবার। কিন্তু রোগের উপশমের লক্ষণ নেই। গলা চিরে রক্ত বেরোচ্ছে ঠিক যেন নিয়ম করে একদিন অন্তর। কবিরাজ অর্জুনের কানে-কানে বলে দিলেন, "রাজব্যাধি এর নাম, রাজরাজড়ার ঘরে পোষায়। পথের মানুষ তুমি, কেন উড়ে এসে ঘাড় পেতে দিলে? করতে পারবে না কিছুই, মিছে বদনামের ভাগী হওয়া। সাধুমশায়ের ছেলে শুনেছি বিষম বদরাগী, আর মামলাবাজ। চেষ্টা-যত্ন করছ, আমি ভয় করছি পরিবর্তে তোমার হাতে-দড়ি না পড়ে।"

বাজে কথা, ভয় দেখানো কথা—অর্জুন এসব কানে নেয় না। আসলে কবিরাজ নিজে হালে পানি পাচ্ছেন না, তাই ভয় দেখিয়ে অর্জুনকে ভাগিয়ে দেবার মতলব। ন্যাড়াকেও এমনিধারা দুষ্টমন্ত্র দিয়েছিলেন কি না কে জানে। কবিরাজের সঙ্গে শেষাশেষি খুবই জমজমাট হয়েছিল নাকি তার।

কবিরাজের কথা অর্জুনের কানে যায়, মনে বসে না। তারপর সাধুচরণ নিজেই একদিন অর্জুনকে বললেন, "মুখে রক্ত ওঠা আমার আজকের ব্যাধি নয়। ষোল আনা সংসারধর্ম ব্যাপার-বাণিজ্য নিয়ে ছিলাম, তখনও মাঝেমধ্যে এইরকম রক্ত উঠত। তুমি বাবা অনেক করছ—এমন সেবা অনেককাল আমি পাইনি। কিন্তু বুঝতে পারছি, এখন এ-বয়সে আর কিছু হবার নয়। মধুগঞ্জ নামে যে গঞ্জ-জায়গাটা, দেখেছ তুমি? চোখে না দেখলেও নাম শোনা আছে নিশ্চয়?"

অর্জুন ঘাড় নেড়ে দিল। দেখেনি সে মধুগঞ্জ, নামও শোনেনি। সাধুচরণ বলে যাচ্ছেন, "বাদাবন নয় সেটা, বরঞ্চ মানষেলা জায়গা। বন্দর। বাদাবন সেখান থেকে দশ-বারো ক্রোশ দূর। রবিবারে বিষ্যুতবারে হাট বসে, দক্ষিণবাদার অন্তত অর্ধেক কেনাবেচা ঐখানে হয়। আমার ছেলে ভৃগুচরণের মস্ত বড় গোলদারি দোকান, ঐখানটায় পৌঁছে দাও বাবা। বউমা-নাতিপুতিরাও সেখানে। তাদের কাছে পৌঁছে দিয়ে এসো। শেষ কটা দিন ছেলেবউয়ের সেবা নেব, বড় ইচ্ছা আমার। প্রাণ ভরে আমি তোমায় আশীর্বাদ করব।"

অর্জুন শিউরে উঠে বলে, "ওরে বাবা! অত পথ নিয়ে যাব কেমন করে? নজর দিতে নেই, ওজনেও বেশ তো ভারিক্কে-সারিক্কে আছেন।"

সাধুচরণ সে-কথা হেলায় উড়িয়ে দেন, "কিচ্ছু না, কিচ্ছু না—থলিতে ভরে কাঁধে ঝুলিয়ে ড্যাং-ড্যাং করে চলে যেও। মজাই লাগবে। আর এক কাজ করতে পারো, সেইটে আরও ভাল, গায়ে আঁচড়টি লাগবে না। মধুগঞ্জের হাটবার বুঝে আমাদের কানাইডাঙায় বটতলার ঘাটে চলে যেও। হাটুরে নৌকো বিশ-ত্রিশখানা ছাড়ে ওখান থেকে, তারই একটায় ব্যবস্থা করে নিও। হাঁটতেই হবে না তাহলে, শুয়ে-বসে আরাম করে পৌঁছে যাবে।"

"তা হলেও কানাইডাঙা অবধি বয়ে নিয়ে যাওয়া থলিতে, সেও বড় চাট্টিখানি কথা নয়। আর আস্ত হাতি-ঘোড়া পুরে ফেলব থলিতে, তেমন থলিই বা পাচ্ছি কোথায়?"

"থলি আমি দিয়ে দিচ্ছি। আমার মতন লম্বা-চওড়া একজনকে নিয়ে যাচ্ছ, কেউ কিছু টেরই পাবে না। একটা তুলোর বালিশ কাঁধে পড়ে আছে, এমনি মনে হবে।"

ন্যাকড়ার শতজীর্ণ ছোট্ট এক থলি, বৃদ্ধ তাই বের করে দিলেন শিয়রের নীচে থেকে। হি-হি হা-হা করে হাসেন খানিক। "হাঁদারাম ন্যাড়াচন্দোর হতচ্ছেদ্দা করে জিনিসটা ফেলে গেছে। অথচ যা-কিছু আমার নিয়ে গেছে, সব জিনিসের সেরা জিনিস হল এই।"

আবার বলেন, "থলিটা নিয়ে নাও বাবা। মুখ আলগা করো। তারপর যাকে থলিতে ঢোকাতে চাও, তার চেহারার আদলটা আন্দাজি মনে এনে বিড়বিড় ছড়া বলবে—

থলে দিল দেড়েল ভাই
ঢুকতে কোনো বাধা নাই

আর অমনি দেখবে থলের মধ্যে সুড়ুত করে সেইজন ঢুকে গেছে, মানুষ হোক আর জন্তু-জানোয়ারই হোক।"

অর্জুন অবাক হয়ে বলে, "এই তো এক পুঁচকে থলে। চওড়ায় লম্বায় এক হাত দেড় হাতের বেশি হবে না। যদি ইচ্ছে করেন, আস্ত ঐরাবত ঢুকে যাবে এর মধ্যে?"

সাধুচরণ তার কথা লুফে নিয়ে বলেন, "যাবে তাই। তোমার মনে ঐরাবত আসছে—আমায় দেখে নিশ্চয়। তা সম্ভব বটে। ঐরাবতের চেয়ে আমি খুব একটা কম যাইনে। বেশ তো, ছড়া পড়ে দ্যাখো তুমি পরখ করে যে, সত্যিই ঢুকে যাই, না বাইরে পড়ে থাকি।"

অর্জুন সাধুচরণের আপাদমস্তক আরও একবার দেখে নিয়ে থলির মুখ খুলে বিড়বিড় করে ছড়া পড়ে গেল।

অবাক কাণ্ড। অত বড় দেহ পলকে একটা বড় সাইজের পুতুলের মতন আকার নিয়ে টুক করে থলিটুকুর মধ্যে ঢুকে গেল। ঢুকে সগর্বে সাধুচরণ বললেন, "সত্যি না মিথ্যে বলছি, পরখ হল তো? এইবারে এখন বাইরে বেরুনো, নয়তো চিরকাল আমায় এই থলির মধ্যে থেকে যেতে হবে। বাইরে যাবার জন্য আলাদা এক ছড়া—

আদুড় গায়ে বাদুড় যায়
থলি থেকে বাইরে আয়।"

ছড়া পড়ল অর্জুন আর থলি থেকে লহমার মধ্যে সাধুচরণ বেরিয়ে এলেন।

হরি হরি, এ কোন্ চেহারা সাধুচরণের। প্রায় এক বনবিড়াল। বনবিড়ালের মতন ভুরম্যাঁও ভুরম্যাঁও করছে। সেই ধরনের ডাক, তেমনি গলার আওয়াজ। আর সামনের পা দুটো বারংবার থলির মুখের দিকে তুলছেন তিনি। স্পষ্ট ইঙ্গিত: আমায় থলির মধ্যে ঢুকিয়ে দাও আবার। ঢোকাও, ঢোকাও! পা দুটো জোড় করে অনুনয়ের ভঙ্গিতে অর্জুনের দিকে তাকালেন। অর্জুনের নজর পড়ল, দু'চোখে জল গড়াচ্ছে বিড়ালরূপী সাধুচরণের। ভাল-মন্দ কিছুই না বুঝে অর্জুন ছড়া

পড়ে দিল, যাতে থলির মধ্যে ঢুকে পড়ে। বনবিড়াল সাধুচরণ অমনি ঢুকে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে বনবিড়ালের ডাক গিয়ে খলখল খিকখিক মানুষের হাসির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে থলির ভিতর থেকে। বলছেন, "মস্ত বড় এক ফাঁড়া কাটল রে অর্জুন। স্বমূর্তিতে ফেরানোর ছড়া তোমায় শেখাতে ভুলে গিয়েছিলাম। বাইরে বেরিয়ে থাকলে তখন আর উপায় নেই, বিশবার কি পঞ্চাশবার বললেও একটি বর্ণ তখন কেউ বুঝত না। বলছি এবার, শিখে নাও। 'আদুড় গায়ে বাদুড় যায়' এইসব বলেই তার ঠিক পরের কথা—

বিনি সুপারির পানের খিলি
যা, হয়ে যা যেমন ছিলি।

পুরো ছড়া পরখ করো এবারে তুমি।"

ছড়া পুরোপুরি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাধুচরণ থলি থেকে বেরুলেন। আগেকার সেই বিরাট বিপুল চেহারা।

॥ ২ ॥

মিছে সময়ক্ষেপ নয়। রওনা এবার মধুগঞ্জে। সরাসরি নয় অবশ্য। আগে কানাইডাঙা ঘাট অবধি। এই পথটা সাধুচরণ যাচ্ছেন অর্জুনের কাঁধে চেপে থলির ভিতরের বনবিড়াল হয়ে। বার-তারিখ সমস্ত হিসাব করে নিয়েছেন। মঙ্গলবার রাত্রে কানাইডাঙার ঘাটে পৌঁছলেন। তারপরে সাধুচরণ আর বনবিড়াল নেই, থলি থেকে মুক্তি ঘটেছে। পুরোপুরি মোটকা মানুষ এখন। পথের অন্যান্য সঙ্গীদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছেন। দোকান থেকে চিঁড়ে গুড় কিনে রাত্রির সেবা হল। ঝুরি-নামা বড় বটগাছের তলায় শুয়ে বসে রাত কাটানো হল।

ছোট-ছোট হাটুরে ডিঙি। খুদে ব্যাপারীরা ধানচাল খেজুরগুড়ের কলসি ফলমূল ইত্যাদি বোঝাই দিয়ে এ-হাটে সে-হাটে কেনাবেচা করে বেড়ায়, হাটুরে নৌকো সেইজন্য নাম। ভাড়া বাবদ পয়সা-কড়ি লাগে না, গতরের খাটনি খেটে দিতে হয়। বৈঠা বাওয়া, গুনটানা, চড়নদারদের জন্য রসুইবাস, তামাক সাজা, এই সমস্ত করতে হয়।

হাটুরে-ডিঙি রীতিমত এক দর্শনীয় বস্তু। ডাইনে বাঁয়ে ষোলোখানা বৈঠা। তা ছাড়াও এক অতিরিক্ত বৈঠা কাড়ালে মাঝির হাতে হালের কাজ করে। ষোলোবৈঠা সমতালে জলে পড়ছে, ডিঙি ছোট্ট একটা পাখির মতো নদীজলের গা বেয়ে উড়ে চলেছে যেন। বাতাস পেলেও ডিঙি পাল খাটাতে চায় না, বৈঠার গুণে যেন উড়ে বেড়ায়।

একটা ডিঙির কাছে গিয়ে অর্জুন বলল, "মধুগঞ্জে যাব মাঝিভাই, ছাড়বার দেরি কত?"

ঐটুকু ছেলের কথায় মাঝি সকৌতুকে বলে, "হাটুরে-নৌকোয় যাবে, কী-সওদা নিয়ে যাচ্ছ দেখাও আগে।"

সহাস্যে অর্জুন সওদা দেখিয়ে দিল। সাধুচরণ। গঞ্জে যা বেচাকেনা হবে, তাকে সওদা বলা হয়। সাধুচরণ হেন সওদা দেখে মাঝি তো হেসেই খুন। অর্জুন তাড়াতাড়ি বলে, "আমার মোটকাদাদু, গায়ে-গতরে কিছু বেঢপ হলেও মস্ত বড় সাধু ইনি। গঞ্জের সেরা দোকান ওঁর ছেলের। যে ভাড়া দাবি করেন, তাই দেওয়া যাবে।"

মাঝি বলে, "আমাদের যে ভাই হাটুরে মাল ছাড়া অন্য কিছু বোঝাই দেবার নিয়ম নেই।"

অর্জুন কাতর হয়ে বলে, "বড্ড ঠেকে গেছি এই বুড়ো দাদুটিকে নিয়ে। পৌঁছে দিতেই হবে। বয়স হয়ে গেছে, আপনজনের মধ্যে গিয়ে থাকতে চান। ভাড়ার বাবদ আমি গতরে খাটব, ওঁর ভাড়া নগদ টাকায় আগাম দিয়ে দিচ্ছি। এক, দুই, তিন, চার। চার-চারটে এই পুরোপুরি রুপোর টাকা। এই দেখুন, আর আমার নেই, থাকলে তাও দিয়ে দিতাম। চারটে টাকা নিয়ে ক্ষমাঘেন্না করে ভাড়া শোধ করে নিন।"

ছেলেমানুষ এত কাকুতি-মিনতি করছে, দয়া হল চড়নদারদের। মাঝির দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে দেয়। অর্থাৎ, বেকায়দায় পড়েছে বুড়ো থুত্থুড়ে মানুষটাকে নিয়ে। উঠে পড়ুক। আর কী হবে।

ছাড়ল ডিঙি। অর্জুনের উপর বাঁধা হুকুম, যতক্ষণ সে ডিঙির উপর আছে, কলকের আগুন নিভতে দেবে না। অর্থাৎ, তামাক সেজে অনবরত চড়নদারদের মুখের সামনে ধরবে। কলকে নিভে গেলে তাকেও নেমে যেতে হবে তার ঐ মোটকা দাদুকে কাঁধে তুলে নিয়ে। অর্জুন ষোলো-আনা রাজি। ষোলো-আনা কেন, ষোলোর উপরে আঠারো-আনা।

চুক্তি হল, সবই হল, ডিঙিও ছুটল। কিন্তু দুটো বাঁক পার হতে না হতেই কোথায় বা কী! একসঙ্গে তিন কলকেয় আগুন দিয়ে অর্জুন একটা খোদ মাঝি-মশায়ের হাতে তুলে দিয়ে এল, একটা দিল কাড়ালের দিকে। এক টান দু-টান করে বোঠেওয়ালারা টেনে ছাড়ছে, আর তৃতীয় কলকে দিল মাঝবয়সী একজনকে, হরিদারোগা কিম্বা দারোগাভাই বলে ডাকছে তাকে সকলে। হরিদারোগা কিন্তু কলকে নিতে চায় না। বলে, "ভাঙা বোঠে কোত্থেকে এনে আমার হাতে তুলে দিয়েছে, দিয়ে তারাই দ্যাখো হাসাহাসি করছে এখন। মজা দেখছে। বোঠে ছেড়ে এখন যদি আমি কলকে ধরি, ওরা আমায় আস্ত রাখবে ভেবেছ?"

দারোগার গায়ে ঘামের স্রোত। কষ্ট হয়েছে খুব সন্দেহ নেই। অর্জুনও নাছোড়বান্দা। "ভাল তামাক, আমি আলাদা কায়দায় সেজেছি। দু'টান টেনে দ্যাখো, সব কষ্ট জুড়িয়ে যাবে। আরামে তুমি তামাক খাও, বোঠেও তোমার ঘুমোবে না দেখো, তোমার হয়ে কয়েকটা টান আমিই টেনে দিচ্ছি।"

অর্জুনের কথা শুনে চড়নদার একটি তো হেসেই খুন। "তুই বোঠে টানবি! বলিস কী রে ছোঁড়া! টানের মুখে বোঠে আটকে তুই নিজেই তো মুখ থুবড়ে জলে পড়বি। বাহাদুরিতে কাজ নেই, যা করছিস, করে যা। এখন তামাক সাজ, রাত্তির হলে ঘুমোবি ভুঁড়েলদাদুর ভুঁড়িতে মাথা রেখে। ছেলেমানুষ, আরাম করে ঘুমোস—কেউ কিছু বলতে যাবে না।"

কথা কানে না নিয়ে অর্জুন সাজা-কলকে হরিদারোগার হাতে তুলে দিল। বলে, "বড় যত্ন করে সেজেছি, টেনে বুঝবে। কেমন হয়েছে বলো আমায়।"

বলেই, হরির হাতের বোঠে যেন সে ছোঁ মেরে নিয়ে নিল। নিয়ে পা লম্বা করে দিয়ে প্রচণ্ড এক টান। এতগুলো বোঠে যাচ্ছে, কিন্তু অর্জুনের বোঠের টান একেবারে আলাদা। সবচেয়ে প্রচণ্ড। টানের গুঁতোয় ডিঙি মচর-মচর করছে। দেখাদেখি অন্যরাও মেতে উঠল। ডিঙি সাঁ-সাঁ করে ছুটেছে। গলুই থেকে মাঝি 'বাহবা, বাহবা' তারিফ করে উঠল। "ভালা রে বাপ আমার! যতক্ষণ গতরে কুলোয়, চালিয়ে যা, বোঠে ছাড়বিনে, মুঠো নরম করবিনে। তামাক-সাজা কিম্বা আর

দশটা ফাই-ফরমাস আপাতত হরিদারোগাই করতে থাকুক। ঐ সব কাজ আসলে হরিরই. মউল-নৌকোয় যখন যায়, পুরোপুরি ঐ সমস্ত সে করে। একলা তাকেই ঐ সব করতে হয়। কানাকর্তার দরবার পার হয়ে যাই, তারপরে নাহয় হরির বোঠে হরিকে ছেড়ে দিস। তার আগে কখনো নয়। হরির বোঠে মারার ঢঙ্ দেখে আমার তো বাপু ভয় হয়ে গেছল।"

নিজ হাতের হালের বৈঠাতেও মাঝি প্রবল আলোড়ন লাগিয়েছে। আর সকলকে তাতিয়ে দিচ্ছে। "দরবারবাড়ির কানাকর্তামশায়কে কলা দেখিয়ে তারপরে থামাথামি। তামাক খাওয়া গল্পগুজব যত খুশি কোরো তখন।"

গোটা গ্রামের নাম রাজবাড়ি। আর দরবারবাড়ি হল ভদ্রানদীর তীরে খুব নাম-করা শৌখিন প্রাসাদ একটি। নৌকো থেকে দোতলা প্রাসাদের খানিক-খানিক দেখা যাচ্ছে। সত্যি, আহামরি বস্তু। কবিস্বভাবের সেকেলে কোনো রাজা বানিয়েছিলেন। একটা চোখ কানা ছিল তাঁর, লোকে আজও তাই কানারাজার বাড়ি বলে। কানারাজা বহুকাল লয় পেয়ে গেছেন, দরবারবাড়ি ভেঙেচুরে ইটের স্তূপ হয়েছিল। অনেককাল পরে বিস্তর হাত ঘুরে ইদানীং হাইকোর্টের বিখ্যাত উকিল কেশব চক্রবর্তীমশায় রাজবাড়ি গ্রাম, দরবারবাড়ি প্রাসাদ এবং যাবতীয় সম্পত্তির পত্তনিদার হয়েছেন। কয়েক লক্ষ টাকা খরচা করে দরবারবাড়ি নতুন করে গড়েছেন আবার, রংচং করেছেন। কিন্তু হলে হবে কী, অতবড় বাঘা উকিল হয়েও দরবারবাড়ি কবজায় আনতে পারছেন না। পুরনো কালের সেই কানাকর্তা অবধি এসে ঘোরতর মচ্ছব জমান দলবলসহ। নানা তল্লাটের আরও বিস্তর ভূতপেত্নি আসে। তবে সন্ধ্যা অতীত হয়ে যাবার পর, রাত্রিবেলা। দিনমানে কিছুই নয়। চারিদিক ফাঁকা, হা-হা করছে।

এই দরবারবাড়ি নিয়ে মাঝিদের যত আতঙ্ক। যাক, ফাঁড়া কেটেছে। দরবারবাড়ির দূরে তারা এখন। আর দুর্ভাবনা নেই। এবার বোঠে মারো ধীরেসুস্থে। গল্পগুজব করো যত খুশি। গুলতানি করো। রাতটুকু নৌকোয় কাটিয়ে কাল সন্ধ্যা নাগাত মধুগঞ্জে পৌঁছানো যাবে। হাটবার পরশু, সকাল থেকেই জমতে শুরু করবে।

শেষ ভাঁটায় হাটুরে-ডিঙি মন্থর গতিতে চলেছে। জ্যোৎস্নায় ফুটফুট করছে নদীজল, নদীর এপার-ওপার। সাধুচরণের বড় আনন্দ—অনেক কাল পরে, একেবারে অন্তিম বয়সে আত্মজনদের কাছে চলেছেন। জীবনের বাকি দিনগুলো তাদের সঙ্গে কাটবে। দেশে-ঘরে তো এসে পড়েছেন এখন। কানাকর্তার দরবারবাড়ি পার হবার পর থেকেই সাধুচরণের মনে প্রবল স্ফূর্তি। ন্যাড়া অকূলে ভাসিয়ে দিয়ে পালিয়েছিল, সাধুচরণ তাই খুব মুষড়ে পড়েছিলেন। সে-ভাব সম্পূর্ণ কেটে গিয়ে নতুন জীবন পেয়েছেন এখন যেন। ঘুমঘোরে আনন্দের চোটে নাক দিয়ে এক-একবার ব্যাঘ্রগর্জন ওঠে। খিলখিল করে হেসে অর্জুন মোটকা দাদুর নাক চেপে ধরে গর্জন বেরুনো বন্ধ করে দেয়। কাঁচা ঘুম ভেঙে সাধুচরণ খানিকক্ষণ অর্জুনের দিকে চোখ পিটপিট করেন। আবার ঘুমোন তিনি, আবার চলে নাকের গর্জন।

অর্জুনের ঘুম নেই এক লহমাও। হরিদারোগার সঙ্গে আচ্ছারকম জমিয়ে নিয়েছে। হরির হাতের বৈঠা ছিনিয়ে নিয়ে বেয়ে দিচ্ছে এক-বাঁক দুই-বাঁক। আর উৎকর্ণ হয়ে শুনছে বাদাবনের নানান আজব গল্প। বিশেষ করে মউলেদের গল্প, মৌচাক ভেঙে মধু-সংগ্রহ যাদের পেশা। হরিদারোগা অন্তত বিশবছর ধরে এই কাজে আছে। ভয়াল জঙ্গলের মধ্যে বাঘ-সাপ-কুমিরের পাশ কাটিয়ে দিব্যি এক মজার কাজ। বিপদ বেশি বলে মজাটাও বেশি।

হরি হল মউলের দারোগা। পুলিশ-দারোগা জানি—বুক দুরুদুরু করে তাদের পাকানো গোঁফ দেখে। মউলে-দারোগা হল একেবারে বিপরীত। জঙ্গলে নেমে জন্তু-জানোয়ারের, এমন কী একটা মৌমাছিরও মুখোমুখি হতে হয় না তাকে। সব মউলে নেমে পড়ে বাদায় ঢুকে যায়, একলা দারোগা নৌকোয় বসে মাল পাহারা দেয়। রাঁধাবাড়া করে রাখে মউলেদের জন্য। প্রতি মউলের জন্য তোলো-হাঁড়ি সাফসাফাই রাখে, মধু নিয়ে ফিরে এলে যার মধু তার হাঁড়িতে পরিপাটিরূপে ঢেলে রাখে। কাজ কঠিন নয়, কিন্তু দায়িত্বের কাজ।

হরিদারোগা নাছোড়বান্দা। বলে, "তোমাকেও আমি মউলে না করে ছাড়ব না ভাইটি। মধু কেটে আজকাল ভাল রোজগার, একবার গিয়েই রস পেয়ে যাবে। মধুগঞ্জে পৌঁছে গিয়েই ডিঙি বদলাব, হাটুরে-ডিঙি ছেড়ে মউলে-ডিঙি। আমি হলাম এক জাতমউলে। আরও কতশত আছে আমার মতো। মধুগঞ্জ মউলেদের বড় ঘাটি, নাম থেকেই মালুম। গিয়ে দেখতে পাবে, ঘাটে ঘাটে মউলে-নৌকোর ভিড়। এখন সব বনে ঢুকে যাবে, ফিরবে আবার মধুর ভরা নিয়ে। বেচাকেনার ভিড়টা দেখতে পাবে তখন।"

গল্পের পর গল্প। বাদাবনে এত রকমের কাজ আর এমন সব রকমারি গল্প। বাঘের শয়তানি থেকে মৌমাছির প্রতিহিংসা। গল্পে গল্পে পুবের আকাশে সূর্য দেখা দেবার গতিক। বোঠে অর্জুনের হাতে। হাতে বোঠে চালালে মুখের গল্পে দানা বাঁধে না, হরির বোঠে অর্জুন তাই ছিনিয়ে নিয়েছে। হাতে সে বোঠে মারছে, আর দু'কানে হরিদারোগার মজাদার গল্প শুনছে। চারিদিক ফরসা হয়ে গেল। অর্জুন বলে, "দ্যাখো, দ্যাখো দারোগাদা, থোকা-থোকা কালো শ্যাওলা সারবন্দী কেমন ভেসে যাচ্ছে।"

ঘাড় ঘুরিয়ে হেসে হরি বলে, "শ্যাওলা নয়, আধ-পচা বেগুন। পরশুদিন সন্ধ্যাবেলা ডুমুরের হাট ভাঙলে অন্তত বিশ ঝুড়ি বেগুন পোলের উপর থেকে গাঙের জলে ঢালছে, স্বচক্ষে দেখলাম। তারই কিছু এদিকে এসে পড়েছে। হাতের কাছে যে কটা পাও, তুলে ফেলো দেখি। আমাদের মউলেদের কাজে লাগবে।"

গল্পের গন্ধ পেয়ে হাঁ-হাঁ করে ওঠে অর্জুন, "কী রকম ? কী রকম ? কী কাজে লাগবে ? বেগুন জলে ঢালতে গেল কেন তারা ?"

"বেগুন-খেতে এবার অপর্যাপ্ত ফলেছে। দামে খুব শস্তা, দু'পয়সা চার-পয়সার বেশি কুড়ি নয়। সে কুড়িও আবার গোনাগুনতি কুড়িটা নয়। এক কুড়ির উপর পাঁচটা-সাতটা ফাউ। এত শস্তা জিনিসেরও খদ্দের নেই, হাট ভেঙে যায়, তখনও ঝুড়ি-ঝুড়ি পড়ে আছে। এই বোঝা আবার বাড়ি ফেরত নিয়ে যাবে ? বয়ে গেছে, বয়ে গেছে ! পুলের উপর দাঁড়িয়ে খেতল ঝুড়ি উপুড় করে ঢালল আমারই চোখের সামনে। বলল, 'চার ক্রোশ দূরে আমার বাড়ি, সেখান থেকে বোঝা বয়ে এনেছি, আবার তাই ফেরত বইতে হবে ?

মা-গঙ্গাকে দিয়ে গেলাম।' সেই বেগুনেরই দুটো-চারটে ভাসতে ভাসতে এদিকে এসে পড়েছে। যা পারো তুলে নাও অর্জুনভাই। মধু রাখতে হবে নতুন তোলো-হাঁড়িতে। হাঁড়ির তলায় বেগুনের বোঁটা ঘষে নিলে মধু বেশ ভাল থাকে।"

॥ ৩ ॥

মধুগঞ্জ অবশেষে। হাট লাগবে কাল সকাল থেকে। এখনই ঘাটে এমন ভিড় যে, নৌকো রাখার জায়গা পাওয়া দুষ্কর। সাধুচরণ অর্জুনের উপরে গদগদ। "তুমিই দাদা আমায় শেষ আশ্রয়ে এনে দিলে। এত কষ্ট অন্য কেউ করত না। ভাল হবে তোমার। ঈশ্বর মঙ্গল করবেন।"

অর্জুনের মনে তৃপ্তি। কাউকে কিছু করতে হল না। হাটবার না হলে মধুগঞ্জে লোক বেশি থাকে না। খবর অল্পেই ছড়িয়ে যায়। হাটুরে-নৌকো পৌঁছানোর সামান্য পরেই ভৃগুচরণ ছুটতে ছুটতে ঘাটে এল। সঙ্গে বড় ছেলে মণ্টু ও ছোট মেয়ে রানি। অর্জুনের পরোপকার ও সেবার কথা সাধুচরণ শত মুখে শোনাচ্ছেন। যে শোনে, সেই মুগ্ধ হয়ে যায়, আশীর্বাদ করে অর্জুনকে।

বাপকে ভৃগুচরণ দোকান-বাড়ি নিয়ে গেল। অর্জুনকেও ছাড়ল না, সে-ও থাকবে সেখানে যতদিন খুশি। অন্তত যতদিন না ভাল মউলে-নৌকো পাওয়া যাচ্ছে। ভৃগুচরণ বলে, "চাক কাটতে চাও, তা হরিদারোগার কতটুকু ক্ষমতা, সে কী করবে? অনেক মহাজনের টিকি আমার দোকানে বাঁধা। মধু ভেঙে এনে আমাকেই দেয়। আমারই টাকায় নৌকো ভাড়া করে বনে যাবে, ফিরে এসে আগাম দেওয়া টাকা শোধ করে দেবে।"

মউলে-নৌকো প্রথমখানার খুব তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা হয়ে গেল। করে দিল ভৃগুচরণই, বাপের কথায় ও অর্জুনের ধরাধরিতে। এবং ছোট ছেলে পিণ্টু ও ছোট্ট খুকি রানির আবদারের জন্যও বটে। ঘুষের লোভ দেখিয়েছে অর্জুন, বন থেকে ফেরার সময় ভাইবোনের জন্য মধু-ভরা মৌচাক আনবে, দেখে অবাক হয়ে যাবে তারা। হরিও যাচ্ছে এই দলের দারোগা হয়ে। এরও মূলে অর্জুন।

কারিগর মোটমাট বারো, তার উপরে দারোগা হরি। এবং আরও একটি—আমাদের শ্রীমান অর্জুন। অর্জুন কোনো বিশেষ কাজ নিল না। এই প্রথমবার গিয়ে শুধুমাত্র চাক কাটার ঘাঁতঘোঁত বুঝে আসবে। টাকাপয়সাও এমন কিছু দরকার নেই তার। কী করবে সে টাকা দিয়ে? খরচপত্রের গরজ না থাকলে টাকা তো বোঝাবিশেষ।

খড়কুটো যোগাড় করে মউলেরা তড়পা বানাতে লেগে গেছে। দেখতে যেন বেঁটেখাটো লাঠি। সেই জিনিস এক একটা কাঁধে তুলে নিল কারিগরেরা। সৈন্যদল যেন তলোয়ার নিয়ে যাচ্ছে। মিছে নয়, লাখ-লাখ মৌমাছির বিপক্ষে তড়পাই ওদের প্রধান সমরাস্ত্র।

ছয়জন করে দল। দু'দলে ভাগ হয়ে একদল ঢুকল দক্ষিণ দিককার বনে, আর দল পশ্চিমে। অর্জুনের তড়পা নেই, শূন্য হাতে যাচ্ছে। খুশিমতন যাচ্ছে সে। কখনও দক্ষিণে, কখনও বা পশ্চিমে। চোখ সকলেরই আকাশমুখো। উড়ন্ত মৌমাছি দেখছে। মৌমাছির ঝাঁক ডানদিকে গেল তো মউলেদের সবকটা মাথা ডাইনে। মৌমাছি বাঁয়ে ঘুরল তো মউলেদের মাথাও কলের পুতুলের মতন একসঙ্গে বাঁয়ে ঘুরে গেল। মাছিকে কক্ষনো এরা নজরছাড়া হতে দেবে না, তা অদৃষ্টে যা-ই ঘটুক। মাটির দিকে দেখছে না তো, হয়তো বা পানি-কাদায় আছাড় খেয়ে পড়ল, হয়তো বা শুলোর গুঁতো

ছবি: সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

খেয়ে পা ছিড়ে কেটে রক্তাক্ত হচ্ছে। হয়তো বা বাঘে অনুসরণ করছে, বাঘ ঘাড়ের উপর পড়ে টুঁটি কামড়ে নিয়ে চলল, মউলের তখনও নজর ঘুরিয়ে অবস্থাটা দেখে নেবার ফুরসত নেই।

কোন্ মাছির ঝাঁক হন্তদন্ত হয়ে ফুলে ফুলে মধু খুঁজে বেড়াচ্ছে, আর কোন্ ঝাঁক মধু পেয়ে স্ফূর্তিতে এখন চাকে জমা দিতে চলেছে, মাছি ওড়ার ধরন দেখে মউলে সব বুঝে নেয়। মধু নিয়ে চাকে ফিরছে তো রক্ষে নেই, মউলেরা কিছুতেই রেহাই দেবে না। যত উঁচু গাছ আর যত ঘন ডালপালাই থাকুক, তার ভিতরের মৌচাক ঠিক তারা বের করে ফেলবে। 'তড়পা' এইবারে খুব কাজে আসে। আগুন দিয়েছে তড়পার মুখে, তাতে আগুন হল সামান্য, ভলকে ভলকে ধোঁয়াই বেরুচ্ছে। ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল চারিদিক। মাছি কিন্তু ভয় পেয়ে যায়—আগুন লেগে তাদের চাক বুঝি পুড়ে ছাই হয়ে যায় এবার, যার মধ্যে এত কষ্টের মধুর সঞ্চয় রয়েছে। চাক রক্ষার জন্য মাছিরা চতুর্দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ডালপালার ভিতরে চাকের ঠিক-ঠিক জায়গাটা মউলেদের এতক্ষণ সুস্পষ্ট জানা ছিল না—এবারে সর্বনাশের মুখে মৌমাছিরাই তা জানিয়ে দিল। উত্তাপে প্রাণ দিল কতক মৌমাছি, পালাল কিছু। চাক এখন প্রায় মাছিশূন্য। নির্বিঘ্নে চাক কেটে গাছতলায় আনল। আহা রে, মধু নয়, যেন মুক্তো, চাকের মধ্যে টলমল করছে।

নৌকোয় চাক চালান করে দিল হরিদারোগার হেপাজতে। যা করবার, এরপর সে-ই করবে। কারিগরের দল নতুন চাকের সন্ধানে নতুন একদিকে দৌড়ল যথারীতি আকাশমুখো তাকিয়ে।

দরকারে কাঠবিড়ালির মতো সুড়সুড় করে বড় বড় গাছের মাথায় উঠে যাবে। পরমুহূর্তেই হয়তো বা সড়াক করে নেমে পড়বে। সমস্তটা দিন ধরে এই নিয়মে চলে।

বাদাবনে বিপদ পায়ে পায়ে। বাঘ সাপ হাঙর কুমির ইত্যাদি বড়রা তো সর্বক্ষণই সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছেন: চেহারায় অতি তুচ্ছ ও সামান্য হলেও প্রতিহিংসা নেওয়ার ব্যাপারে মৌমাছিরাও একরত্তি কম যায় না। মৌমাছির মধ্যে সব চেয়ে দুর্ধর্ষ হল, সূর্যমুখী নামে যে চাক, তার বাসিন্দারা। বিষম বদরাগী এইসব মাছি, বড় দুঃসাহসী। মউলে দেখলেই হাজারে হাজারে গিয়ে আক্রমণ করবে। হুলের কী সাংঘাতিক জ্বলুনি। মউলের গা-হাত-পা ফুলিয়ে মুহূর্তে চেহারা ভিন্ন রকম করে দেয়। প্রাণে বাঁচবার আশায় মউলে তখন গাঙ খাল বিল যেটা সামনে পায়, ঝাঁপ দিয়ে পড়ে। কুমির-কামটের ভয় থাকে না তখন। ডুব দিয়ে জলের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে রাখে। কিন্তু কতক্ষণ! দম আটকে অসহ্য হয়ে আবার যেই মুখ তুলতে গেছে, উঁহু, আবার ডুব। মাছিদের রাগ একটুকুও কমেনি। যেখান থেকে মানুষটা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, এতক্ষণ ঠিক সেইখানেই সূর্যমুখী মাছিরা দলবদ্ধ হয়ে চক্কোর দিয়ে ফিরছে। কতক্ষণ থাকবে কে জানে? ডুব দিয়ে এবারে মউলে সারা গায়ে আচ্ছা করে নোনা কাদা মাখল দেওয়ালে চুনকাম করার কায়দায়। তবু রেহাই হয় না।

একদিন গেল, দু'দিন গেল, বিপদ অল্পসল্প, মারাত্মক তেমন কিছু নয়। তিন দিনের দিন কিন্তু সাংঘাতিক। বাঘ পিছু নিয়েছে তাদের। মউলেরা যথারীতি উড়ন্ত মৌমাছির পিছনে দৌড়চ্ছে, আর দক্ষিণ-দলের কাছাকাছি চলেছে এক বাঘ, অতি সন্তর্পণে, বেশ খানিকটা দূরে-দূরে। গোড়ায় কেউ দেখতে পায়নি, দেখেছে শুধু বানর, গাছের ডালে বানরের নাচানাচি। বানর হল বাঘের জাতশত্রু, কিন্তু অপর জন্তু-জানোয়ারের পরম বন্ধু। গতিক বুঝে যত বানর এই তল্লাটের গাছে গাছে এসে জুটেছে, দুড়দাড় করে লাফাচ্ছে এ-ডাল থেকে ও-ডালে, ক্যাঁ-ক্যাঁ করে শোরগোল তুলেছে দস্তুরমতো। বনের কোনো জন্তুর এর পরে অবস্থা বুঝতে বাকি থাকে না: সামাল, সামাল, বাঘ পিছু নিয়েছে!

তোলপাড় পড়ে গেল চতুর্দিকে। যে যেখানে যে-কাজে ছিল কাজ ফেলে রে-রে করে দৌড়ল। কিন্তু বাঘ কোথা! চারিদিকে খোঁজ-খোঁজ পড়ে গেছে, বাঘ একেবারে নিপাত্তা। এক কাঠুরে নিজ চোখে দেখেছে, লাফ দিয়ে বাঘ বেশ
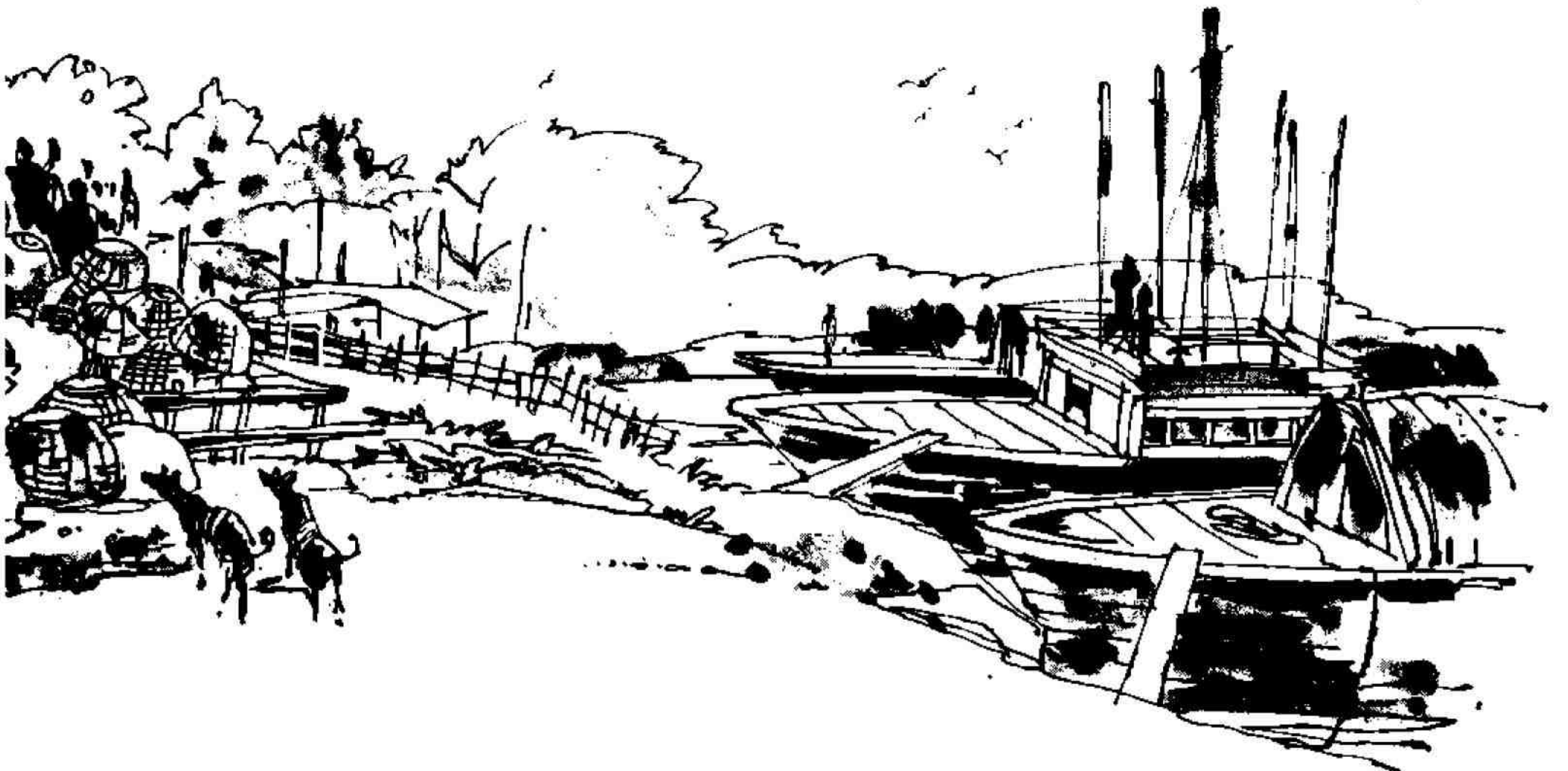
খানিকটা উঁচু হয়ে এক মউলের ঘাড়ে পড়ল। স্পষ্ট দেখেছে সে, মা-বনবিবির দিব্যি করে বলছে। অথচ, যেন ম্যাজিক, কোনোদিকে কোথাও বাঘের আর নিশানা নেই। যেন পাখনা মেলে উড়ে পালিয়েছে।

অর্জুন টিপিটিপি হাসছিল। তারপর এত মানুষের জমায়েত আর শোরগোল করে বাঘ খোঁজাখুঁজিতে সে আর চেপে থাকতে পারল না, হো-হো করে উদ্দাম হাসি হেসে উঠল। বলে, "এই যে তিনি। কিন্তু বাঘ কে বলবে, ডুরেকাপড়-পরা ফুটফুটে কনেবউটি। পালকির অভাবে আমার এই থলের মধ্যে গুটিসুটি হয়ে বসে, বেহারা বিহনে আমারই কাঁধে চেপে চলেছেন। বউ দেখবেন তো থলির মুখ একটু আলগা করে দিচ্ছি, নতুন বউয়ের মুখ এক এক নজর সবাই দেখে নিতে পারেন।"

থলির মধ্যে আটক হয়ে বাঘ এখন একটুকু মেনিবিড়ালের মতো। বাঘ দেখিয়ে দিয়ে আর কোনো কথাবার্তা নেই—হন হন করে অর্জুন আর এক দিকে চলল।

সর্দার-কারিগর জিজ্ঞাসা করে, "চললে কোথা ? আমাদের সঙ্গে যাবে না ?"

অর্জুন ঘাড় নাড়ল। "না, শখ মিটেছে। খেপে গিয়ে মৌমাছিরা সময় সময় হুল বসায় বটে, তা হলে-ও বলব, খুব সাচ্চা শ্রমিক তারা। সারা দিনমান তারা তিলেক বিশ্রাম নেয় না, এ-ফুল সে-ফুল খুঁজে খুঁজে এক-ফোঁটা দু'ফোঁটা করে মধু এনে জমায়। তাদের মধুভাণ্ডারে ডাকাতি করতে মনে বড্ড লাগে আমার। মউলের এই কাজ আমার দ্বারা হবে না।"

নামিয়ে-আনা চাকের একটুকরো গামছায় বেঁধে, বাঘের থলি পিঠের উপর ফেলে অর্জুন হন-হন করে চলল।

মউলে-সর্দার বলল, "তা এক্ষুনি চললে কোথা ? এই যাত্রাটা অন্তত থেকে যাও। মধুগঞ্জে ফিরে গিয়ে মধুর ভাগবাঁটোয়ারা করে নিয়ে তারপরে যেখানে খুশি যেও।"

অর্জুন বলে, "যাচ্ছি মধুগঞ্জেই। তোমরা কাজ করে যাও, আমি একলহমাও আর এর মধ্যে নেই। তোমাদের সঙ্গে এই ক'দিন ঘুরেছি, তার জন্য এক পয়সাও চাইনে। বাঘটুকু নিয়ে এসেছি ভৃগুদার ছেলে মণ্টুর জন্য। আর চাক রানি খুকুর, চুষে চুষে মধু খাবে সে। তাদের কথা দিয়ে এসেছিলাম।"

॥ ৪ ॥

ভর সন্ধ্যা। হেঁটে হেঁটে অর্জুন ক্লান্ত। এক বাড়ির উঠানে এসে দাঁড়াল। মধ্যবয়সী টেকো মানুষটি ভুঁড়ি আলগা করে হুঁকো টানছিলেন। অর্জুন জোড়হাতে জিজ্ঞেস করল, "গোমস্তা—হুজুরের বাড়ি তো এই ? হুজুরই বোধ হচ্ছেন সেই তিনি।"

"কোথা থেকে আসছ তুমি ছোকরা ?"

"গাঙের ধারে 'কানাকর্তার দরবার', আপাতত সেখান থেকে। তার আগে মালঞ্চের জঙ্গলে মধু কাটার কাজে ছিলাম কিছু দিন। ভাল লাগল না—মউলের কাজে ইস্তফা দিয়ে দল ছেড়ে চলে এসেছি।"

গোমস্তা বললেন, "ইস্তফা দিলে কেন বাপু ? মধুর কাজ তো বেশ ভাল। ভাল রোজগার হয়।"

অর্জুন বলে, "অন্যায় রোজগার আমার গরপছন্দ। ভেবে দেখুন, সারা দিন ধরে সর্ব তল্লাটে ঢুঁড়ে ফোঁটা ফোঁটা মধু সঞ্চয় করল।—আমরা দল বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়ে সব মধু ডাকাতি করে আনি। অন্যায় নয় বলুন হুজুর।"

বার বার 'হুজুর হুজুর' করছে, গোমস্তা একেবারে গলে যাচ্ছেন। ছোকরা বিনয়ী বটে ! গোমস্তা শুধালেন, "তা এদিকে চলেছ কোথা ?"

"এখানেই, হুজুরের কাছে। 'কানাকর্তার দরবার' নামের যে বাড়ি দেখে এলাম, শুনলাম তার ষোলআনা কর্তা এখন আপনিই।"

প্রবল ঘাড় নেড়ে গোমস্তা বলেন, "ভুল শুনেছ—একেবারে ডাহা মিথ্যা। বর্তমান মালিক হলেন মহামহিম কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী এম এ, বি এল মহাশয়, মোকাম মহামান্য কলকাতা হাইকোর্ট।"

অর্জুন নাছোড়বান্দা হয়ে বলে, "কাগজপত্রে যা-ই হোক, আপনিই আসল আমি নানা সূত্রে জেনে এসেছি। অনেক আশা করে বিস্তর কষ্টে এসেছি, আমায় বঞ্চিত করবেন না।" বলে সে গোমস্তার পা জড়িয়ে ধরতে যায়। তিড়িং করে লাফিয়ে হাত দুয়েক পিছিয়ে গিয়ে গোমস্তা বলেন, "কী চাও তুমি, খুলে বলো।"

অর্জুন বলে, "আসার পথে বিকালবেলা কর্তার দরবার আরও একটা পাক দিয়ে এসেছি। আহামরি বাড়িখানা। এ-বাড়ি কলকাতা শহরের কান কেটে দেয়। ঐ বাড়িতে একটা রাত্রি বাস করে যাব, যদি অনুমতি দান করেন। সকালে উঠেই রওনা দেব। যদি আদেশ করেন কাকপক্ষীকেও জানতে দেব না আমার এই রাত কাটানোর কথা।"

গোমস্তা হো-হো করে উচ্চ হাসি হাসেন। "সে কী কথা, জানতে না দেবার কী হল ? আমরাই তো ঢাকঢোল পিটিয়ে জানান দেব, যদি সকালবেলা কাল বহাল তবিয়তে বেরিয়ে আসতে পারো। সঙ্গে সঙ্গে নগদে পাঁচ-পাঁচটা টাকা পারিতোষিক, উকিলবাবুর আদেশ। সেকেলে এক পুরনো বাড়ি লাখ লাখ টাকা খরচা করে নতুন চেহারায় গড়ে তুললেন। অথচ একটা রাতও বসবাস করতে পারলেন না, এত টাকা এবং চেষ্টা পরিশ্রম ন দেবায় ন ধর্মায় গেল, এর জন্য কি কম দুঃখ আমাদের মনে ? বাঘা উকিলের বক্তৃতার দাপটে এজলাসের সাহেব সুবোরা পর্যন্ত কেঁচো হয়ে যান, কিন্তু ভূতেরা গ্রাহ্য করে না। দরবারবাড়িতে সত্যি সত্যি যদি রাত কাটাতে চাও, এক্ষুনি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। কিন্তু চুক্তিপত্র লিখে দিতে হবে : তোমার জীবনহানি কিংবা কোনোপ্রকার বিপদ-আপদের জন্য আমরা বিন্দুমাত্র দায়ী হব না।"

আবার বলেন, "দাও লিখে যেমন যেমন বলি। তারপর সই মেরে দিয়ে আমাদের খরচায় একপেট খেয়ে ড্যাং-ড্যাং করে ঢুকে যাও দরবারবাড়ি। ভাল খাট-পালঙ্ক উত্তম বিছানাপত্র—নাকে বাঘ ডাকিয়ে এক ঘুমে রাত কাবার করতে পারবে,—শোওয়ামাত্র, যদি না বিচ্ছুগুলো এসে ভুতুড়ে নাচ জুড়ে দেয়।"

অর্জুন সগর্বে ছড়ার সুরে বলল—

ভূত আমার পুত, পেত্নি আমার ঝি,
বাঘ ধরে থলিতে পুরি, ভূতে করবে কী ?

গোমস্তা বলেন, "বেলা ডুবু-ডুবু। এক্ষুনি যাবতীয় ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, চলে যাও অকুস্থলে।"

কথাবার্তার মধ্যে পড়শি কয়েকটি এসে দাঁড়িয়েছে।

একজনে বলল, "পাঁচ টাকা পারিতোষিক কিন্তু বড্ড কম গোমস্তামশায়। রেট আপনাদের বাড়িয়ে দেওয়া উচিত।"

গোমস্তা সহাস্যে বলে, "কত চাই? পঁচিশ? পঞ্চাশ? পাঁচশো? কোনো আপত্তি নেই। টাকা দেব তো রাত পোহানোর পরে। নিশ্চিত জানি, কিছুই দিতে হবে না। বয়সে ছেলেমানুষ এরা, মুখে লম্বা লম্বা কথা বলতে কোনো অসুবিধা তো নেই!"

অর্জুন বিরক্ত হয়ে বলে, "হাঁটা-পথে বড্ড পরিশ্রম হয়েছে, ঘুমে চোখ ভেঙে আসছে আমার। এমন ভাল দালান-কোটায় শুতে পাব, টাকা মোটে না-পেলেই বা কী? খাবার-টাবার কী দেবেন, তাড়াতাড়ি দিয়ে দিন। নাকে মুখে শুঁজে একছুটে দরবারবাড়ি গিয়ে পড়ি গে। বিছানা-টিছানা আছে শুনেছি, না থাকলে-ই বা কী! মেঝের উপর রাত কাটিয়ে দেব।"

গোমস্তা বলেন, "কিছু নিতে হবে না ছোকরা। ভিতরে গিয়ে বুঝবে; শৌখিন মানুষের কত সাধের বাড়ি। ঘরে ঘরে সাজানো খাট-পালঙ্ক, বিছানা-বালিশ-মশারি। দিনের বেলা হলে আমি নিজে সঙ্গে থেকে সব দেখিয়ে দিতাম। সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে, আমরা কেউ আর ওখানে ঢুকতে পারব না। একলা গিয়ে দেখেশুনে নাও গে, আমরা আশেপাশেই থাকব।"

ঢুকে গেল অর্জুন।

"ভালয় ভালয় ফেরো কাল সকালে—তখনই বোঝা যাবে কত বড় সাহস আর শক্তি ধরো তুমি।"—পড়শি সবাই বলাবলি করছে। বাড়ির ধারে ওঝা-বদ্যিও এনে মোতায়েন করেছেন গোমস্তামশায়। সবাই উৎকর্ণ হয়ে আছে, দরবারবাড়ির ভিতর থেকে কোনোরকম আওয়াজ আসে কিনা।

যা ভাবা গিয়েছে, ঠিক তাই। দুড়ুম-দাড়াম আওয়াজ ভিতরে। যেন গজকচ্ছপের লড়াই ছোকরাকে তালগোল পাকিয়ে এক্ষুনি বুঝি বাইরে ছুঁড়ে দেবে। আগেও কতজনাকে দিয়েছে এমনি।

কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, অনতিপরেই একেবারে চুপচাপ। রাত ঝিমঝিম করছে। তালগোল পাকিয়ে অর্জুনকে ছুঁড়ে দিল না—। অত্যধিক ডেঁপো বলে সম্ভবত গলা টিপে শেষ করে দিয়েছে। যত যাই হোক, বাড়ির মধ্যে ঢুকে রাত্রিবেলা কিছু করবার সাধ্য নেই। অন্ধকার থাকতেই বাড়ির ভিতরে ঢুকে যাওয়া—এত তাগত কারো হবে না। রাত পোহালে তখন এসে খোঁজ করে দেখা যাবে। যা দেখবে, সে অবস্থা ভালমতোই জানা। অনেকের ক্ষেত্রে দেখেছে, এবারও দেখবে।

বাতি হাতে অর্জুন ঘরে ঢুকল। ঢুকেই শুয়ে পড়ল। শুতে না শুতেই ঘুম। ঘুমের মধ্যে মনে হচ্ছে সুড়সুড়ি দিচ্ছে কারা তার গায়ে। চুল টানছে, কান টানছে। পা ধরে টানাটানি করছে।

'এই-এইও' বলে তাড়া দিল অর্জুন ঘুমজড়িত কণ্ঠে। কেউ গ্রাহ্য করে না, একটানে তখন মাথার বালিশ সরিয়ে নিল। তাতেও অর্জুনের দৃক্‌পাত নেই। শোবার সময় মাথার বালিশ কদিনই বা পেয়ে থাকে?

"বড্ড উৎপাত আরম্ভ করেছিস তোরা। মানা করছি, তা কানে যায় না বুঝি?"

ভূতেরা এবার করল কী, খাটের মাথা ধরে ঘুমন্ত মানুষসুদ্ধ খাড়া করে তুলল। এমনি অবস্থায় শোওয়া যায় না, দুড়ুম করে মেঝেয় পড়ে গেল।

অর্জুন রেগেমেগে বলে, "ভাল কথায় হবে না দেখছি। আঙুল না বাঁকালে ঘি ওঠে না। ভাল কথা বললাম, বড্ড ধকল গেছে আমার, শান্তিতে একটু ঘুমোতে দে। তা কিছুতেই যখন শুনবিনে, ব্রহ্মাস্ত্র ধরি তা হলে।"

বলে, সে ছড়া পড়ল:

খুলেছি সন্ন্যাসীর থলে,
ঢুকে যা সব দলে দলে!

ছড়া শেষ হতে না হতে ঘোর অন্ধকারের মধ্যে অর্জুন স্পষ্ট বুঝতে পারছে কী কতকগুলো পোকা থলির মধ্যে ঢুকে গেল।

খলখল করে হাসে অর্জুন। বলে, "দেখলি তো এবার? ক্ষমতা বোঝ তা হলে।"

থলির মুখে দড়ি ঝুলছে, দড়ি দিয়ে কষে মুখ বেঁধে অর্জুন বলে,"একেবারে চুপচাপ থাকবি, একবিন্দু বজ্জাতি করবি নে। ঘুমোব আমি। তোরাও পড়ে পড়ে ঘুমো। সকালবেলা তা

হলে ছেড়ে দেব।"

বলে, নিশ্চিন্তে অর্জুন ভসর-ভসর করে গভীর ঘুম ঘুমোতে লাগল। এক ঘুমেই রাত প্রায় কাবার। উষাকালে, আকাশ তখনও চারিদিক ভাল করে পরিষ্কার হয়নি, ভূত বেচারাগুলোর জন্য কষ্ট হচ্ছে অর্জুনের। এগুলো ছেলেমানুষ ভূত—থলির ভিতরের ছটফটানি দেখে মালুম হচ্ছে। অর্জুন বলল, "যা, ছেড়ে দিচ্ছি এবার। কাউকে আর কখনো জ্বালাতন করতে যাবিনে। ভূতের স্বভাব-দোষ সেটা জানি, কিন্তু পাড়ার মধ্যে ভুতুড়ে কাণ্ড-মাণ্ড একদম চলবে না। অভ্যাস যদি ছাড়তে না পারিস, পাড়া ছেড়ে শ্মশানে কি গোরস্থানে চলে যা, যা তোদের চিরকালের জায়গা। ভুতুড়ে কাণ্ড-মাণ্ড করগে সেখানে গিয়ে, কিছু বলতে যাব না আমরা। আপন ঘাঁটি ছেড়ে মানুষের জায়গায় কেন এসে চেপে থাকিস তোরা—নানান রকমের বজ্জাতি করিস? এবারে পেলে আর তোদের আস্ত রাখব না, হুঁশ থাকে যেন।"

সকাল হল। দরবারবাড়ির সামনেটায় বেশ খানিকটা ভিড়। গোমস্তামশায় অগ্রবর্তী হয়ে বললেন, "বাইরের ছেলে হয়েও আমাদের মধ্যে এসে তুমি এতবড় ঝুঁকি নিয়েছিলে, বড্ড উদ্বেগ ছিল তোমায় নিয়ে। দু'চোখ এক করতে পারিনি সারারাত্রির মধ্যে। কিন্তু তুমি তো ভালই ছিলে, বোঝা যাচ্ছে।"

নিরুত্তরে অর্জুন কাঁধের থলে মাটিতে নামিয়ে মুখ খুলে দিল। ভিড়ের মানুষ অবাক হয়ে দেখছে মুখ খুলে অর্জুন ছড়া পড়ছে :

আদুড় গায়ে বাদুড় যায়,
থলি থেকে সব বেরিয়ে আয়—

যেই না বলা, শোঁ-শোঁ-শোঁ একরকম অদ্ভুত আওয়াজ উঠল থলির ভিতরে। তারপর পরমাশ্চর্য ব্যাপার—থলির মুখ দিয়ে চামচিকে জাতীয় একপ্রকার জীব ঝাঁকে-ঝাঁকে বেরুতে লাগল। আকাশ অন্ধকার হবার উপক্রম। বাচ্চা-ভূতেরা বেরিয়ে অর্জুনকে ঘিরে পুরো একটা চক্কর দেয়। তার পায়ের কাছে মাথা নামায় একবার। তারপর উড়ে উড়ে নানান দিকে পালিয়ে যায়। আকাশ এখন স্বচ্ছ ও সুন্দর।

এতক্ষণে হাসিমুখে অর্জুন বলল, "দরবারবাড়িতে স্রেফ ভূত-পেত্নির দরবার, এ সমস্ত আপনাদের ভয়-দেখানো বানানো গল্প—আরামে রাত কাটিয়ে আমি হদ্দমুদ্দ বুঝে এসেছি। বলুন, তাই কিনা? ভিতরের কথা ভাঙুন।"

আবার বলে, "গোড়ায় কিছু চামচিকে-আরশুলারা গায়ে পড়ে মুখে পড়ে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাচ্ছিল। বেয়াদবি দেখে রাগ হয়ে গেল আমার। উঠে তখন থলিতে ভরে ফেললাম। থলির ভিতরে কিচিরমিচির কান্নাকাটি—বললাম, একটুও শব্দ করবি নে, খবরদার। ভোর অবধি চুপচাপ পড়ে থাক। আমার ঘুমের একটুও যেন অসুবিধা না হয়। রাত পুইয়ে গেলে আমার পায়ের গোড়ায় নাকে খত দিবি, আর উড়ে পালাবি। চুক্তিটা ছিল এই। তাই দেখলেন না, আমার পায়ে মাথায় এক-এক ঠোক্কর দিয়ে ভক্তি জানিয়ে পালাতে লাগল।"

রোদ উঠে গিয়ে বেশ খানিকটা বেলা হয়েছে। গোমস্তামশায় অর্জুনের সর্বাঙ্গ ঠাহর করে দেখে বলেন, "তোমার গায়ে দেখছি আঁচড়টুকুও লাগেনি। অবাক কাণ্ড।"

অর্জুন ভালমানুষের মতো বলে, "কী জানি, কী সব বলছেন আপনারা। ভূত না ঘোড়ার-ডিম। সবই ভাল ওখানে। চমৎকার ঘরবাড়ি, খাসা খাট-বিছানা, ঘুমানোর ভারী মজা। এত সুখের ঘুম জীবনে আমি কমই ঘুমিয়েছি।"

গোমস্তা প্রস্তাব করেন, "বলছিলাম, কী বাবাজীবন, আজকের রাতটাও তোমায় ঘুমোতে হবে ওখানে। একলা নয়—আরও দুজনকে দিচ্ছি তোমার সঙ্গে। পারিতোষিক পাঁচ নয়, দশ নয়, থোক পঁচিশ।"

অর্জুন প্রবল ঘাড় নাড়ল। "না-না-না। টাকার লোভ দেখাবেন না আমায়। আর লোকও চাইনে আমার সঙ্গে। কাল তো একলাই ছিলাম, বেশ ছিলাম। কোনো অসুবিধা হয়নি।"

"তোমার জন্য নয় গো, বাবাজি। এই যে দুজন, এরা আমাদের বরকন্দাজ, ওদের সাহস বাড়বে তোমার সঙ্গে রাত কাটিয়ে এলে, সেই ভরসায় পাঠাচ্ছি। বাবু আমাদের মবলগ খরচা করেছেন দরবারবাড়ির জন্য। নিজেরা ভোগ করবেন বলেই। বাড়ি এইরকম ভূতের কবলে বিসর্জন দেবার জন্য নয়।"

হেসে অর্জুন বলে, "কাল যা কাটিয়েছি, অত আরামে শোওয়া সত্যিই ভাগ্যের কথা। আমার জীবনে অমন কমই ঘটেছে। দুটো দিন কেন, দরকারে আমি ঢালাও দশ দিনও থেকে যেতে পারি।"

॥ ৫ ॥

সন্ধ্যা আসন্ন। আজকেও আবার দরবারবাড়িতে শুতে চলেছে। যাচ্ছে তিনজন। অর্জুন সকলের আগে, একফোঁটা বালক হয়েও দলের দলপতি সে। কাছারির বরকন্দাজ ষণ্ডা ও গুণ্ডা অর্জুনের পিছন পিছন যাচ্ছে। ষণ্ডার হাতে লোহা-বাঁধানো পাঁচহাতি লাঠি, গুণ্ডার কাঁধে শালকাঠের প্রকাণ্ড মুগুর। মুগুর-চালনায় গুণ্ডার নাকি জুড়ি নেই দিগরের মধ্যে।

আসার মুখে গোমস্তামশায় এদের আচ্ছারকম খাইয়ে দিয়েছেন। রকমারি খাদ্য পেয়ে এরাও নিদারুণ রকম সেঁটেছে। শোওয়ারও অতি উত্তম ব্যবস্থা—কালকের চেয়েও ভাল। তিন তিনখানা গদিআঁটা পালঙ্ক পাশাপাশি। এ-হেন পালঙ্কের উপর বাপের জন্মে শোয়নি তারা কেউ। অর্জুনের তো শুতে না শুতেই ঘুম। ষণ্ডা-গুণ্ডা এপাশ-ওপাশ করে।

ঝুলন্ত লণ্ঠনের জোরালো আলো সারা ঘর দিনমান করে ফেলেছে।

হঠাৎ দেখা গেল, কোথাও কিছু নেই, দরজার কাছে এক-খাবলা ঘন অন্ধকার। সে অন্ধকার এমন ঘন যে, মনে হয় বর্শা মারলে বিঁধে যাবে। অন্ধকার ক্রমশ বড় হতে লাগল। বড় হয়ে হয়ে সমস্ত ঘর যেন গ্রাস করে ফেলল। আলোটা দপদপ করতে লাগল হঠাৎ। নিভে গেল। এবং সঙ্গে সঙ্গে কোনো অদৃশ্য পুরুষ দুই বরকন্দাজের গলা টিপে ধরে বিছানা থেকে উঁচু করে তুলল। তুলতে তুলতে একেবারে ঘরের ছাত অবধি তুলে ফেলেছে—ছাতের কড়িবরগা মাথায় ঠেকছে। মুখ দিয়ে ষণ্ডা-গুণ্ডার কথা বেরুচ্ছে না গলা টেপার চোটে। গাঁ-গাঁ-গাঁ উৎকট আওয়াজ বেরুচ্ছে।

আওয়াজে অর্জুনের ঘুম ভেঙে গেল। কী, কী ব্যাপার! ভূত ষণ্ডা-গুণ্ডার গলা ছেড়ে দিল। পড়ল তারা খাটের গদিতে নয়, দুম করে কঠিন মেজেয়। হাড়গোড় চুরমার হয়ে গেছে মনে হল। নাকিসুরে এক ভূত বলল, "ন্যাড়া-বটতলার মহাশ্মশানে কাল রাত্রিবেলা সারা গাঁয়ের সমস্ত কর্তাভূত জমায়েত হয়েছিল। সেই সব জরুরি কথাবার্তার মধ্যে বাচ্ছারা ছিল না। বাবুর এই বাগানবাড়িতে এসে তারা সব লাফালাফি, ঝাঁপাঝাঁপি করছিল। কায়দায় পেয়ে তোরা সেইসব কচিকাঁচাগুলোকে সারারাত থলির মধ্যে আটকে রেখে নাক ডেকে ঘুমিয়েছিস। আজ তার শোধ তুলব।"

অর্জুন বলে, "তা ষণ্ডা-গুণ্ডার উপর আক্রোশ কেন? ওরা মোটে আসেইনি কাল। যত যা কিছু আমি একাই করেছি। ক্ষমতা থাকে, আমার উপরে শোধ তোলো।"

সর্দার-ভূত হাত ছয়েক লম্বা একখানা হাত বাড়িয়ে অর্জুনের কান ধরতে গেল। আর অর্জুন অমনি থলির মুখ খুলে দিয়ে বিড়বিড় করে ছড়া পড়ল। ভূতমশায় তক্ষুনি টিকটিকির মতো পাকিয়ে গোলাকার হয়ে টুক করে থলির মধ্যে ঢুকে গেল। মুখ বেঁধে ফেলল অর্জুন। দেশলাই জ্বেলে নিভনো লণ্ঠন আবার জ্বেলে দিল। ঘরে আবার যেন দিনমান। ষণ্ডা-গুণ্ডাকে অর্জুন বলে, "তোমাদের মুগুর-লাঠি কই?"

"লাঠি-মুগুর অন্ধকারের মধ্যে কোথায় যে ছিটকে পড়ল, ঠাওর পাইনি।"

অর্জুন বলল, "ঘরের মধ্যেই আছে, যাবে কোথায়? খাটের নীচে কি আর কোথাও গড়িয়ে পড়েছে। বের করো।"

পাওয়া গেল লাঠি। এবং মুগুরও। অর্জুন বলে, "পেটাও এইবারে। দমাদম পেটাও থলির উপর। কর্তা-ভূতদের আস্পর্ধা বড় বেশি, উচিত শিক্ষা দিয়ে দাও।"

গদি বানানোর সময় ধুনুরিরা যেমন তুলো পেটায়, দুই বরকন্দাজ তেমনি থলি পেটাতে আরম্ভ করল। ষণ্ডা-গুণ্ডাকে ভূতেরা বিস্তর নাজেহাল করেছে, তারই এবার শোধ তুলবে। ভূতমশায়রা বস্তাবন্দি—করবার কিছু নেই তাদের। বস্তার উপর প্রচণ্ড বিক্রমে মুগুর ও লাঠি পড়ছে। থলি দুই পায়ে থেঁতলাচ্ছে বরকন্দাজ দুজনে। থলির উপরে উদ্দাম নৃত্য করছে। থলির ভিতরে কুঁই-কুঁই, বিড়ালছানার মতো অসহায় আর্ত ধ্বনি। দরজার উপরে এইসময় আরও কতকগুলো ছায়া। অর্জুন চট করে থলির মুখ সামান্য আলগা করে বলে, "তোমরাই বা বাইরে বাইরে কেন? চলে এসো।" বলে, আর একবার ছড়া পড়ল। সুড়ুত-সুড়ুত করে আরও কতকগুলো ঢুকে গেল। থলির মুখ বন্ধ করে দিয়ে আবার পিটুনি। তুমুল আর্তনাদ। অর্জুন অবশেষে ষণ্ডা-গুণ্ডাকে ইঙ্গিতে থামতে বলল। বলে, "আসবি আর কখনও তোরা দরবারবাড়ি?"

"আজ্ঞে না।"

"কান মল, নাক মল্।"

চেষ্টা খানিকটা করে থাকবে, থলির ভিতরে নড়াচড়ার লক্ষণ সুস্পষ্ট দেখা গেল। তারপর সকাতরে ভূতেরা বলে, "হয় না। হাতই নাড়ানো যাচ্ছে না ভিতরে। কী করব?"

"আচ্ছা, ছাড় করে দিচ্ছি, বেরিয়ে আয়। মনে থাকে যেন, কোনোদিন এ-বাড়ির, এই পাড়ার ত্রিসীমানায় কেউ আসবিনে। দলের মধ্যে ভাল করে বুঝিয়ে দিবি, এখানে এলে খোয়ারটা কী-রকম!"

থলির মুখ খুলে দিয়ে অর্জুন বেরিয়ে আসার ছড়াটুকু পড়ল। একের পর এক বেরিয়ে আসছে ভূত। ঠেঙানি খেয়ে দেহে আর তাদের তাগত নেই—সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। তার উপর অর্জুনের হুকুম-মতো নাকে খত্ দিতে দিতে বাড়ির বার হতে হচ্ছে, উঠোনটা সম্পূর্ণ পার হয়ে গিয়ে তবে বাঁচোয়া। আর কদাপি নয়, এই ভূতজন্ম থাকতে, মনে-মনে সব ভূতের এই প্রতিজ্ঞা। হানাবাড়ি কদাপি আর নয়, দরবারবাড়ি এখন থেকে সত্যি-সত্যি।

ভূত তাড়িয়ে সকালবেলা তিনজনে বেরিয়ে এল। বিজয়ীর গৌরবযাত্রা। বাইরে অপেক্ষমাণ রীতিমত এক জনতা। ভূতের সঙ্গে লড়াইয়ের বৃত্তান্ত সবাই সবিস্তারে শুনতে চায়। ষণ্ডা-গুণ্ডা শতকণ্ঠে অর্জুনের সাহস ও বীরত্বের কথা বলছে। ভূতের দুর্গতিতে ছেলেবুড়ো সবাই হেসে খুন।

লোকের হাজারগণ্ডা ফরমাশ। কেউ বলে, আমার বাগানে ভূত নয়, পেত্নি একটা আস্তানা পেড়েছে। রাত্রি বারোটা বাজলে শ্যাওড়াগাছে উঠে নাকিসুরে ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে। শুয়ে শুয়ে পাড়ার তাবৎ মানুষ শোনে। জ্যোৎস্নারাত্রে দুঃসাহসী কেউ কেউ বাগের কাছাকাছি গিয়ে স্বচক্ষে দেখে এসেছে, ফর্সা রঙের বউ একটি শ্যাওড়াগাছে পা ঝুলিয়ে বসে আকুল কান্না কাঁদছে। পেত্নির কান্না ভারী অলক্ষুনে। ভাই অর্জুন, একরাত্রে ওটাকে তুমি গ্রামছাড়া করে দিয়ে এসো। তুমি ভিন্ন আর কারও দ্বারা সম্ভব হবে না।

এক বৃদ্ধ বলেন, "আমার উঠোনের বেলগাছটায় সন্ধ্যা থেকে এক ব্রহ্মদৈত্যের ওঠানামা। দীর্ঘদেহ, খালি পা, গলায় সুপুষ্ট পৈতের গোছা, খড়ম পায়ে খটখট করে চারিদিকে ঘুরে বেড়ান। আমায় দেখলেই সুড়সুড় করে ডাল বেয়ে গাছের মাথায় উঠে পড়েন। চোখ পিটপিট করেন, উঁকিঝুঁকি দেন, আবার পাতালতার ফাঁকে নীচের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন। এই ব্রহ্মদৈত্যমশায়কে গ্রামছাড়া করে দাও বাবা। তুমিই পারবে।"

অর্জুন বলল, "আমি ওঝা নই। ভূত-পেত্নি ব্রহ্মদৈত্য তাড়ানো আমার পেশা নয়। দরবারবাড়ি অন্তত একটা রাত কাটাব, আমার বড় লোভ ছিল। গোমস্তামশায় ব্যবস্থা করে দিলেন। সেইজন্য তাঁর অনুরোধটা রেখেছি। তা বলে আমি এইসব নিয়ে থাকব না। বাদাবন দেখার ইচ্ছে। যতদূর পারি বনের মধ্যে ঘুরতে চাই। গাছপালা দেখব, বনের পশুপাখি দেখব, ফুল দেখব। আপনারা এ বিষয়ে যদি সাহায্য করতে পারেন, আমার মনের ইচ্ছা-পূরণ হবে, ব্যস্।"

সমাপ্ত

জন্ম - ২৫শে জুলাই, ১৯০১   যশোর বাংলাদেশ
মৃত্যু - ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৮৭ কলকাতা, ভারত

বাংলার মাটি, মানুষ, আকাশ, গাছ গাছালি, গঙ্গা পদ্মার শব্দ নৈশব্দের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে তাঁর সাহিত্যকর্ম। স্কুলে পড়াকালীন কয়েকজন উৎসাহী বন্ধু মিলে একটি হস্ত মুদ্রিত পত্রিকা প্রকাশ করেন। এর পর তিনি ‘বিকাশ’ পত্রিকার সাথে যুক্ত হন। পত্রিকার প্রথম সংখ্যা থেকেই মনোজ বসু লিখতে শুরু করেন। পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যায় লেখকের একটি গল্প প্রকাশিত হয়। গল্পটির নাম ‘গৃহহারা’, লেখক মনোজ মোহন বসু। ‘বাঁশরী’র পৃষ্ঠাতেও ঐ নামে তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ। পিতৃ প্রদত্ত নামের মধ্যপদ লোপ করে পরে তিনি মনোজ বসু হলেন। ‘নতুন মানুষ’ (বিচিত্রা কার্তিক, ১৩৩৭) প্রথম পদক্ষেপ হলেও প্রকৃতপক্ষে ‘বাঘ’-ই মনোজ বসুর কৃতিত্বের পরিচায়ক-এতেই তাঁর সাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা। ‘বাঘ’ গল্পটি সম্পর্কে বিভূতি ভূষণ বন্দোপাধ্যায় তাঁর উচ্ছাসিত প্রশংসা করেছেন। বিভূতি ভূষণ কবি জসীম উদ্দীনের সঙ্গে তাঁর ছিল আনন্তরিক সম্পর্ক। গল্পের পাশাপশি প্রকাশিত হচ্ছিল মনোজ বসুর সৃষ্টিধর্মী কবিতা। তাঁর প্রথম মুদ্রিত কবিতা ‘গোপন কথা’ হেমলতা দেবী সম্পাদিত মেয়েদের কাগজ ‘বঙ্গলক্ষ্মী’ তে ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়।

গুরু সদয় দত্ত প্রতিষ্ঠিত ‘বাংলার শক্তি’ পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে। মনোজ বসু এই পত্রিকাটি সম্পাদনাসহ ‘সাহিত্যের খবর’ পত্রিকাটিও সম্পাদনা করতেন। তিনি ‘বাংলা সাহিত্য একাডেমীর’ (পশ্চিম বাংলা) সভাপতি মন্ডলীর অন্যতম এবং কলকাতার নিখিল ভারত লেখক সম্মেলন ও নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তিনি সর্ব ভারতীয় ও আঞ্চলিক একাধিক সম্মেলনে পৌরহিত্য করা ছাড়াও অসংখ্য সাহিত্য-সাংস্কৃতিক সংস্থার পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন।

জীবনে দুঃসহ অবস্থার মধ্যেও কখনও থেমে থাকেনি মনোজ বাসুর সাহিত্যচর্চা। মনোজ বসুর সাহিত্য চিন্তা তাঁর জীবনচর্যায় একান্ত অনুগামী হয়ে দেখা দিয়েছিল। জীবন অভিজ্ঞতার মধ্যে রয়েছে সাহিত্য চিন্তার প্রতিফলন। ‘আমি সম্রাট’, ‘সেই গ্রাম সেইসব মানুষ’, নিশিটুকুম্ব, ‘নবীন যাত্রা’, ‘একদা নিশিথকালে’, ‘কিংশুক’, ‘মায়াকন্যা’, ‘বন কেটে বসত’, ‘রুপবতী’, ‘সেতুবন্ধ’, ‘ঝিলমিল’ মনোজ বসুর রচনাবলী।

কলেজের ছাত্র থাকাকালীন তিনি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন এবং স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন। তাঁর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার ফসল জমা হয়ে আছে তাঁর লেখায়। স্বাধীনতা আন্দোলন, বীর বিপ্লবীদের ভূমিকা নিয়ে তাঁর লেখা ‘আগস্ট ১৯৪২’, ‘ভুলিনাই’ এক-একটি অমূল্য দলিল। এছাড়া ‘সৈনিক’, ‘বাঁশের কেল্লা’ প্রভৃতি এই সকল রাজনৈতিক উপন্যাসগুলিও স্মরণীয়। মনোজ বসু ভারতীয় সাংস্কৃতিক দলের প্রতিনিধি হিসেবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন। ভ্রমণের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় তাঁর লিখিত ‘ভ্রমণ কাহিনী’, ‘চীন দেখে এলাম’, ‘সোভিয়েতের দেশে দেশে’, ‘নতুন ইউরোপ নতুন মানুষ’, ‘পথচলি’ বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে বেশ কয়েকটি গ্রন্থ হিন্দী, ইংরেজী, গুজরাটি, মারাঠা, মালয়ালাম ভাষায় মুদ্রিত হয়েছে এবং বেশ কয়েকটি গ্রন্থ চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে।

স্বদেশে ও বিদেশে লেখক পেয়েছেন অভাবনীয় স্বীকৃতি ও পুরস্কার। ‘একাডেমী পুরস্কার’ ও ‘নরসিংহদাস’ পুরস্কার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত ‘শরৎচন্দ্র পদক ও পুরস্কার’ অমৃত বাজার পত্রিকা প্রদত্ত ‘মতিলাল ঘোষ’ পুরস্কারে তিনি ভূষিত হয়েছেন। জগৎ ও জীবনের রূপকার মনোজ বসু তাঁর লেখনীতে বিচিত্র রামধনু এঁকেছেন, সৃষ্টি করেছেন রোমান্টিক সাহিত্য জগৎ।

জন্ম যশোর জেলার কেশবপুর থানার ডোঙাঘাটা গ্রামের বিখ্যাত বসু পরিবারে মনোজ বসু জন্মগ্রহণ করেন। মধ্যবিত্ত একান্নবর্তী পরিবারের সন্তান তিনি। গ্রামে তাঁদের ছিল বংশ গৌরব ও প্রচুর খ্যাতি। তাঁর ঠাকুরদাদার লেখার অভ্যাস পিতা রামলাল বসুর মধ্যেও ছিল। তিনি ভাল কবিতা লিখতে পারতেন। দুই পুরুষের সাহিত্যচর্চার সঞ্চয় ছিল মনোজবসুর লেখক হওয়ার পাথেয়। মনোজ বসু সাত বছর বয়সেই বঙ্কিম বাবুর লেখা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে কবিতা লিখতে শুরু করেন। ১৯০৯ সালের জুন মাসে মাত্র আট বছর বয়সে লেখক মনোজ বসু হলেন পিতৃহীন। তখনও পাঠশালার গন্ডি শেষ হয়নি। লেখক হওয়ার সাধ, স্বপ্ন, বাসনা সব কিছুর উপর পড়ল যবনিকা। এক নিদারুন অনিশ্চয়তার মধ্যে প্রথমে নিজ গ্রামে পরে কলকাতায় তাঁর শিক্ষাজীবন চলতে থাকে। কলকাতায় তিনি ভর্তি হন রিপন কলেজিয়েট স্কুলে। ১৯১৯ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় তিনি

কয়েকটি বিষয়ে লেটারসহ প্রথম বিভাগে পাশ করেন। এর পর তিনি বাগেরহাট কলেজে ভর্তি হন। এই বাগেরহাট কলেজের ছাত্র থাকাকালীন তিনি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন এবং স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯২২ সালে তিনি আই. এ পরীক্ষায় পাশ করেন। ১৯২৪ সালে সাউথ সাবারবন কলেজ (বর্তমান আশুতোষ কলেজ) থেকে ডিস্টিংশন নিয়ে বি. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। শুরু করলেন আইন পড়া। কিন্তু অর্থনৈতিক কারণে তিনি আইন পড়া বন্ধ করতে বাধ্য হন। অতঃপর তিনি যোগ দিলেন শিক্ষকতায়। ভবানীপুর সাউথ সাবারবন বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন তিনি শিক্ষকতা করেন। সাহিত্যে আকৃষ্ট হয়ে পরে তিনি পরিপূর্ণভাবে সাহিত্যেচর্চার জন্যে শিক্ষকতা পেশা ত্যাগ করেন। শিক্ষকতাকালীন সময়ে শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি স্কুলের পাঠ্য পুস্তক লেখার কাজেও মনোনিবেশ করেন। ফলশ্রুতি হিসেবে পরবর্তীতে তিনি ‘বেঙ্গল পাবলিশার্স’ নামে একটি প্রকাশনী সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে